অন্তলীনার আকাশ মেঘশূণ্য

মেহেদী হাসান গালিব

গ্রন্থ প্রকাশ

মেহেদী হাসান গালিব

mehedihassangalib@gmail.com

facebook.com/mehedihassan.galib

অন্তলীনার আকাশ মেঘশূণ্য

প্রকাশকালঃ জানুয়ারি, ২০১৬

প্রকাশকঃ গ্রন্থ প্রকাশ, grontho.com

gronth.com@gmail.com

প্রচ্ছদঃ রাগীব নিয়াজ রাফি

প্রচ্ছদের মূল শিল্পকর্মঃ ইতালিয় চিত্রশিল্পী সিলভিয়া পেলিসেরো।

বইটি ক্রিয়েটিভ কমন্স লাইসেন্সের আওতাধীন। এর অর্থ হলো, এই বইটি যে কোনো অবাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বিতরণ ও পুনরুৎপাদনযোগ্য। ক্রিয়েটিভ কমন্স লাইসেন্স সম্পর্কে জানতে দেখুন... http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/

উৎসর্গ : এক মুহূর্তের জন্য হলেও লেখালেখির ক্ষেত্রে যারা আমাকে প্রেরণা জুগিয়েছেন

ভূমিকা

কোন এক গ্রীষ্মের বিকেলে আমার এক বইয়ের পোকা বান্ধবীকে অনলাইনে দেখে ব্যাঙ্গ করে বলেছিলাম, 'বাপরে, তুই ফেসবুকও চালাস।' সে প্রতিত্তুরে বলল, 'এইতো বিভিন্ন লেখকদের লেখা পড়ার জন্য এলাম।' সেদিন কথাটি শুনে খানিকটা বিরক্তবোধ করেছিলাম। একজনের জীবনের ক্ষেত্রটা এতোটুকু হয় কিভাবে? সে কিভাবে শুধু বই পড়েই কাটিয়ে দিতে পারে দিনের পর দিন?

পরে জানতে পারলাম তার বাবা-মা তাকে বাসা থেকে বের হতে দেয় না, কারো সাথে মিশতে দেয় না। আর এই বিষয়টি যে শুধু গুটিকয়েক পরিবারে সীমাবদ্ধ, তা কিন্তু নয়। আমাদের দেশের অধিকাংশ পরিবারেই মেয়েদের বাইরের জগতের সাথে বিচ্ছিন্ন রেখে ঘরের ভেতরে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়ে তোলা হয়। চারকোণা ঘরকেই সঙ্গী হয়েই এরা বেড়ে ওঠে দিনের পর দিন। বাহিরের জগতের প্রায় প্রতিটি বিষয়ই অপরিচিত থেকে যায় তাদের কাছে।

কিন্তু কোন না কোন একসময় তাদের বাহিরের পরিবেশে পা ফেলতে হয়। অচেনা জগতে তাদের এই হঠাৎ বিচরণে তারা চমকে যায়, দুচোখ ভরে বিস্ময় কাজ করে। তারা পেছনে ফিরে দেখে তাদের অদৃশ্য শেকলে মরিচা ধরে ভেঙ্গে গেছে। তারা মুক্ত হয়ে যায়। তারা মুক্ত জীবনের স্বাদ ভোগ করতে বেপরোয়া হয়ে ওঠে। একসময় পা দেয় ফাঁদে। জীবনটা ভেঙ্গে যায় কাঁচের মত। টুকরো টুকরো হয়ে যায় জীবন। টুকরো টুকরো হয়ে যায় নিষ্পাপ গল্প।

তেমনি একটি মেয়ের জীবনের বিভিন্ন মোড় নিয়ে গল্পটি লিখলাম। আশা করি সবার ভালো লাগবে। ভূল-ভ্রান্তিগুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

______মেহেদী হাসান গালিব

১.

সোহান সাহেব একটি বিশাল ঘরে বন্দী। ঘরটির একটিমাত্র জানালা। জানালা গলে সূর্যের আলো ঘরে আসছে। সোহান সাহেব অসহায়ের মত জানালা পানে তাকিয়ে আছেন। হঠাৎ করেই দমকা হাওয়ায় জানালাটি বন্ধ হয়ে গেলো। পুরো ঘর অন্ধকারে ছেয়ে গেলো। অন্ধকার যেনো তাকে ঘিরে ধরেছে, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে তার। ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমটি ভেঙ্গে গেলো। সোহান সাহেব নিজেকে আবিষ্কার করলেন বেলকনির ইজিচেয়ারে। বুকে ম্যাক্সিম গোর্কির 'মা' উপন্যাসটি। পড়তে পড়তেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ইদানিং এই স্বপ্নটি বেশ কয়েকবার দেখছেন তিনি। কেমন যেনো এলেমেলো লাগছে নিজেকে। অস্বস্তিও হচ্ছে। কিছু কিছু স্বপ্ন বেশ বিরক্তিকর। যারা স্বপ্ন বিশ্বাস করেন, তারাই খারাপ স্বপ্ন দেখলে বিরক্ত হয়ে যান। সোহান সাহেবের মুখেও বিরক্তির ছাপ দেখা যাচ্ছে।

সোহান সাহেবের স্ত্রী বর্ষা এক কাপ চা আর আজকের পত্রিকা নিয়ে এলো। বর্ষা রান্নাঘর থেকেই এলো। কোমড়ে গোঁজানো শাড়িই তার প্রমাণ। কোমড়ে শাড়ি গুঁজলে মেয়েদের দেখতে খুব সুন্দর লাগে। এক ধরণের সাংসারী সংসারী ভাব চলে আসে তাদের মধ্যে। চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে পত্রিকাটি হাতে নিলেন সোহান। প্রথম পাতার ডান কর্ণারে ছোট্ট একটি কলামে লেখা 'ঢাবি ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ'। সোহান সাহেব চায়ের কাপ টেবিলে রেখে পত্রিকায় মনোযোগ দিলেন। তার একমাত্র মেয়ে সাবিহা এবার ভর্তি পরীক্ষা দিয়েছে। রোল খুঁজতে গিয়ে দেখলেন যে রোল মনে পড়ছে না। শেষের তিনটি ডিজিট এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। স্ত্রীকে ডাক দিলেন। দুবারের ডাকে বর্ষা রান্নাঘর থেকে এলো। সোহান সাহেব পেপারে চোখ রেখেই জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা সাবিহার রোলটা না কত? আজ ঢাবির রেজাল্ট বেরিয়েছে'। বর্ষা সাবিহার রোলটা বলে কি যেনো বলতে ধরল। কিন্তু রান্নাঘর থেকে প্রেসার কুকারে শিটি বেজে উঠায় আর বলা হল না। দৌড়ে চলে গেল রান্নাঘরে।

খুব মনোযোগ দিয়ে রোল নাম্বারগুলো দেখছেন সোহান। সাবিহার নাম্বারটা খুঁজে পেতে বেশি সময় লাগল না। সে চান্স পেয়েছে! 'এই শুনছো সাবিহা ঢাবিতেও চান্স পেয়েছে।' পত্রিকায় মুখ রেখেই সোহান চিৎকার করে বলল। বর্ষা এবার একরকম দৌড়েই রান্নাঘর থেকে ছুটে আসলো। কই দেখি দেখি বলে পত্রিকা নিয়ে সাবিহার রোলে চোখ বুলাতে লাগলো। এটা বর্ষার স্বভাব। স্কুলের পরীক্ষাগুলোতে যখন সাবিহা ফার্স্ট হতো, তখনও তিনি থেকে থেকেই মার্কশীটে চোখ বুলাতেন আর নিজের কান্ড দেখে নিজেই হেসে উঠতেন।

বর্ষা বেলকনি থেকে পত্রিকা নিয়ে সাবিহার ঘরের দিকে এগুলেন। পেছনে পেছনে গেলেন সোহান সাহেব। ঘরের টানা দেওয়া দরজা খুলতেই কানে ভেসে এলো রবী ঠাকুরের গান।

'আমারও পরানও যাহা চায়,

তুমি তাই, তুমি তাই-ই গো...'

সাবিহার হাতে হুমায়ুন আহমেদের উপন্যাস 'আজ হিমুর বিয়ে'। গভীর মনোযোগ দিয়ে সে পড়ছে। বর্ষা পত্রিকাটি ভাঁজ করে ছোট করে ফলাফলের অংশটা সাবিহার চোখের সামনে ধরলেন। সাবিহা চমকে উঠে 'ওমা' বলে চিৎকার দিয়ে উঠল। নিজেকে সামলে নিয়ে, 'তোমরা কখন এলে আম্মু? আর কি এটা?'। 'তুই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও চান্স পেয়েছিস মা'। বর্ষার চোখ ছলছল করে উঠলো। 'সত্যি!' বলে মাকে জড়িয়ে ধরল সাবিহা।পত্রিকাটি আর দেখল না। আম্মু বলেছে, এখানে আর দেখার কি আছে। সোহান মেয়ের মাথায় পরম আদরে হাত বুলিয়ে দিলো। তারা চলে যাওয়ার পর সাবিহা আবার বইয়ে ডুব দিলো।

এই সময় হঠাৎ যদি কেউ এসে সাবিহাকে দেখতো তবে সে বিশ্বাসই করতো না যে সাবিহা কিছুক্ষণ আগেই তার রেজাল্ট শুনেছে। বিষয়টা অনেকটা এমন যে তার টেকার কথা সে টিকেছে, এতে এতো আনন্দ পাওয়ার কি আছে ? ছোটবেলা থেকেই সাবিহা এমন। খুব কম কথা বলে, শান্ত স্বভাব যাকে বলে আর কি। সেই ছোট থেকেই সে প্রতিটা পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়ে এসেছে। ফার্স্ট হওয়ার পর সে যখন বাবা-মায়ের হাসিমুখটা দেখে তখন তার খুব ভালো লাগে। রেজাল্টের জন্য যতটা না খুশি হয় সে, বাবা-মার খুশিতে তার চেয়ে অনেক বেশি খুশি হয় সাবিহা। বাবা-মার এই হাসিমুখটার জন্যই হয়তো ছোটবেলা থেকে বই ছাড়া আর কারো সাথেই সখ্যতা গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। আস্তে আস্তে যতই বড় হতে লাগল, সে নিজেকে একা অনুভব করতে লাগল। একা একা লাগলেই বই নিয়ে বসে যেতো, ঠিক অনেকটা যন্ত্রমানবের মত।

২.

সোহান সাহেবের যতটা খুশি হওয়ার কথা, ততটা খুশি তাকে মনে হচ্ছে না। কুমিল্লার এই মফস্বল শহরে একা একা বেড়ে ওঠা মেয়েটি ঢাকার মত বড় হয়ে সামলে নিতে পারবে তো?- থেকে থেকেই এই চিন্তাটি তার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। ভয়ে কুঁকড়ে যাচ্ছেন তিনি। নিজে বদলী হয়ে যে সপরিবারে ঢাকায় যাবেন, তারও সুযোগ নেই। সরকারী চাকরীতে বদলীর যে কতো ঝক্কিঝামেলা, তা শুধু এর ভুক্তভোগীরাই জানেন। মেয়ের সাথে কথা বলতে চেয়েও বলতে পারছেন না। মেয়ের সামনে গেলেই চোখটা ছলছল করে ওঠে। আব্বু আব্বু করে সারা ঘর মাতিয়ে রাখা মেয়েটি কি না কিছুদিন পর তাকে ছেড়ে চলে যাবে- বাবা হয়ে কিছুতেই এটা মেনে নিতে পারছেন না। এদিকে সময়ও বেশি নেই। ঢাকায় গিয়ে বাসা কিংবা মেস ঠিক করতে হবে।

'মা আসবো?', সাবিহার ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন সোহান সাহেব।

'আব্বু এসো। হঠাৎ এই সময়ে? কিছু বলবে?'

ধীর পায়ে এগিয়ে এসে সোহান সাহেব সাবিহার বিছানায় বসলেন। মেয়ের চোখে চোখ রাখতেই একে একে সব স্মৃতি চোখের সামনে ভাসতে লাগল। মনে হতে লাগল কিছুদিন আগেই তো

মেয়েটি তার হাত ধরে স্কুল যেতো। লম্বা দুটো বেণী করে স্কুলের বিশাল ব্যাগটি কাঁধে নিয়ে দুলিয়ে দুলিয়ে বাবার হাত ধরে স্কুল যাওয়া মেয়েটিই কি না আজ এতো বড় হয়ে গেলো!

'মা কাল আমি ঢাকা যাচ্ছি তোর থাকার ব্যবস্থা করতে। তুই কি যাবি আমার সাথে?'

'না আব্বু আমি গিয়ে কি করব। তুমি গিয়ে সব ঠিক করে এসো।'

সোহান সাহেব চশমাটি খুলে ফেললেন।দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবতে লাগলেন, 'মেয়েটি আজও একেবারে সহজ সরলই থেকে গেলো। নিজের চাওয়া-পাওয়া বলে তার কিছুই নেই। কিভাবে যে ঢাকায় গিয়ে খাপ খাইয়ে নেবে?'

'আচ্ছা মা, তুই তাহলে একেবারেই যাস।', বলেই সাবিহার ঘর থেকে বের হয়ে এলেন সোহান।

পরেরদিন সকালে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। বন্ধু রেহমানকে আগে থেকেই বলে রেখেছিলেন একটি মেসের জন্য। ঢাকায় পৌঁছুতে পৌঁছুতে বিকেল হয়ে গেলো। রেহমানের বাসায় বেশি সময় নষ্ট না করে রেহমান সাহেবকে নিয়ে চললেন বাসা দেখতে।

ধানমন্ডির শেষপ্রান্তে একটি বাড়ির সামনে এসে গাড়ি থামালো রেহমান। সোহান গাড়ি থেকে নেমে তিনতলা বাড়ির বহিরাবরণে চোখ বুলিয়ে নিলেন। গোধূলিবেলার লাল নীল আলো এসে রাঙ্গিয়ে দিয়েছে বাড়ির আশেপাশের পরিবেশ। বাড়ির চারপাশের বিশাল প্রাচীর পেরোলেই চোখে পড়ে একটি সুন্দর বাগান। ছোট ছোট বিভিন্ন ফুলের গাছে পরিপূর্ণ বাগানটি বেশ চমৎকার লাগছে। বাগানের এক কোণে একটি শিউলি গাছ। সোহানের মনে হতে লাগল- সাবিহার শিউলি ফুল খুবই পছন্দের। ছোটবেলায় সে প্রতিদিন বাসার সামনের শিউলি তলা থেকে এক গাঁদা ফুল কুড়িয়ে এনে মালা বানাতো।

কলিং বেল চাপার কিছুক্ষণ পর দরজা খুললেন একজন মহিলা, নাম শারমিন চৌধুরি। বয়স ষাটের কাছাকাছি। স্বামী মারা গেছেন বছর আটেক হবে। দুই ছেলে বিয়ে করে বিদেশে পাড়ি জমিয়েছে। বই পড়া, গান শোনা এসব নিয়েই পড়ে থাকেন তিনি। গল্প করার ইচ্ছে হলেই মেসের রুমে ঢুঁ মারেন। কোন একটা রুমে বসে গল্প জুড়ে দেন। মেয়েরাও তার গল্প মন দিয়ে শোনে, আড্ডা জমায়। হাসি ছাড়া শারমিন কথা বলতে পারেন না। আর একটুখানি হাসলেও তার গালে অসম্ভব সুন্দর টোল পড়ে। আর এজন্যই হয়তো বা তার কথাগুলো অন্যরকম এক সৌন্দর্য লাভ করে। শারমিন, সোহান আর রেহমানকে তিনতলার বারান্দার পাশের রুমটি দেখালো। জানালা খুলে দিতেই বাইরে থেকে খুব সুন্দর আলো আসতে লাগল। রুমটির সাথেই বারান্দা। এক কথায় রুমটির পরিবেশ খুবই চমৎকার। সোহান সাহেব এদিকে সেদিক তাকাতে তাকাতে বারান্দায় এলেন। নিজের জায়গায় মেয়েকে কল্পনা করতে করতে ভাবছেন, মেয়েটি এখানে ভালো থাকবে

তো? রেহমান কাঁধে হাত রাখায় ভাবনায় ছেদ ঘটলো। 'কি রে কি ভাবছিস তুই এতো? সেই থেকে দেখছি তুই বেশ চুপচাপ' রেহমান খানিকটা উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করল। সোহান কিছুই বলল না। দীর্ঘশ্বাস ফেলে রুমে চলে গেলো। মেস ভাড়া, খাওয়া-দাওয়া সবকিছু ঠিক করে সেইদিন বিকেলেই কুমিল্লা রওনা হল। রেহমান থাকার জন্য এতো জোর করল, কিন্তু সে থাকলো না।

৩.

শারমিন চৌধুরীর বাসার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সোহান সাহেবের পরিবার। সোহান, বর্ষা আর সাবিহা। দাঁরোয়ান বোঁচকাপাতি নিয়ে আগে আগে গেলো। পেছন পেছন এগুতে লাগল তারা। কলিংবেল টিপতেই দরজা খুললেন শারমিন। আজ তার একটুও দেরি হল না। মনে হয় জানতেন এখন কেউ আসবে। দারোয়ানের চোখে চোখ পড়তেই তাকে বললেন সবকিছু তিনতলার রুমে রেখে দিতে। দারোয়ান চলে গেলো। শারমিন সবাইকে ভেতরে আসতে বললেন। সোহান শারমিন চৌধুরীর সাথে স্ত্রী-কন্যার পরিচয় করিয়ে দিলেন। শারমিন সাবিহার দিকে হেসে হেসে বলল, 'আপনার মেয়ে দেখছি খুবই চুপচাপ'। সোহানও হাসলো। সোহানের হাসিটা ভেতর থেকে আসে নি, জোর করেই হাসলো। কিছুক্ষণ কথা বলেই তারা চলে গেলো তিনতলায়।

সাবিহার রুম ঠিক করা হল। খাট পাতানো হয়েছে। তাতে চাঁদর বিছানো হয়েছে। বর্ষা ব্যাগ থেকে জিনিসপত্র ঠিক করে জায়গায় জায়গায় রাখছেন। সাবিহা মাকে সাহায্য করছে। আর সোহান উদাস ভঙ্গিতে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। রুম গোছানো শেষ। বর্ষা এসে সোহানকে তাগাদা দিতে লাগলেন তাড়াতাড়ি যাওয়ার জন্য, কাল আবার তার অফিস আছে। সোহান সাবিহার সাথে কিছুক্ষণ কথা বলে রুম থেকে বের হয়ে এলো। রুম থেকে বের হতেই সোহানের গাল বেয়ে চোখের পানি পড়তে লাগল। ঠোঁট চেপে কোনমতে নিজেকে সামলে নিলো সোহান।

সাবিহা বারান্দার রেলিংয়ে হেলান দিয়ে বাবা-মার চলে যাওয়া দেখছে। তার শুধু মনে হচ্ছে, বাবা-মা কোথাও বেড়াতে যাচ্ছে। বেড়ানো শেষ হলেই আবার তার কাছে ফিরে আসবে। কিন্তু সে ভালো করেই জানে তা হওয়ার নয়। সাবিহার খুব একা একা লাগে। প্রচন্ড কান্না পায়। কিন্তু সে কাঁদতে পারে না। সেই ছোটবেলা থেকেই সে কাঁদতে পারে না। কষ্টগুলো জমাট বেঁধে বুকে বাসা বাঁধে। সে অনেক চেষ্টা করে কেঁদে সেই কষ্টগুলো দূর আকাশে উড়িয়ে দিতে, কিন্তু সে পারে না। বাবা-মা ততক্ষণে ট্যাক্সি নিয়ে অনেকদূরে চলে গেছে। দূর থেকে ট্যাক্সিকে মনে হতে লাগল ছোট্ট একটি হলুদ আলো। সাবিহা রুমে চলে এলো। বালিশে হেলান দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দুর্গেশনন্দিনী' পড়তে লাগল।

বিকেল বেলা শারমিন সাবিহার রুমে এলেন। কিছুক্ষণ পর বুয়া তাদের জন্য চা-নাস্তা নিয়ে এলো। শারমিন তখনো উপন্যাসটি পড়ছিলো। শারমিন হেসে হেসে রাজ্যের গল্প জুড়ে দিলো। সাবিহার বেশ বিরক্ত লাগল। এই প্রথম এমন কাউকে পাওয়া গেলো যে শারমিনের কথায় বিরক্ত হলো। সাবিহা যে বিরক্ত হচ্ছে শারমিন তা বুঝতে পারলেন। তাই আর বেশিক্ষণ কথা না বলেই চলে গেলেন। যাওয়ার আগে সাবিহাকে বললেন এই রুমে আগামীকাল আরও একজন মেয়ে উঠবে। সোহান অবশ্য আগেই এ কথা সাবিহাকে বলেছিল।

৪.

পরেরদিন সকাল বেলা। সাবিহার ঘুম ভাঙ্গলো চিৎকার চেঁচামেচি শুনে। নতুন যে মেয়েটি তার রুমে থাকবে, সে অ তার বাবা-মা এসেছে। মেয়েটির জিনিসপত্র গোছানো হচ্ছে। কিন্তু মেয়েটি থেকে থেকেই চিৎকার করে উঠছে। এটা এদিকে কেনো? এটা ওদিকে দেও আর ওটা এদিকে আনো - এরকম চিৎকার করে সে বাবা-মাকে অস্থির করে রেখেছে। প্রায় তিন ঘন্টা লাগল মেয়েটির জিনিসপত্র সাজাতে। সাবিহা এতোক্ষণ বারান্দায় বসে বই পড়ছিলো। জিনিসপত্র গোছানো শেষে মেয়েটার বাবা-মা চলে গেলো। মেয়েটি এবার ফোন কানে গুঁজে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করেছে। সাবিহার অসহ্য লাগছে। একটা মেয়ে এতো চিৎকার চেঁচামেচি করতে পারে ? অনেকক্ষণ পর ফোন রেখে চুপ করে বসল মেয়েটি। হয়তো বা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

সাবিহা রুমে এসে বালিশে হেলান দিয়ে বই পড়তে লাগল। 'হাই, আমি দিয়া। ঠাকুরগাঁও থেকে এসেছি! ঢাবিতে চান্স পেয়েছি।', সাবিহার দিকে তাকিয়ে মেয়েটি বলল। সাবিহা বেশ বিরক্ত ছিল। তাই সে শুনেও না শোনার ভান করল। দিয়াও আর কথা বলল না। চুপচাপ বসে রইল।

বিকেলের দিকে বাইরে থেকে মোটরসাইকেলের হর্ণের তীব্র আওয়াজ আসতে লাগল। দিয়া এতোক্ষণ রেডি হচ্ছিলো। টাইট জিন্স আর টি শার্ট পড়ে আয়নার সামনে বসে ঠোঁটে লিপস্টিক দিচ্ছিলো। সাবিহা দিয়াকে দেখে আর বিড়বিড় করে বলে- অসহ্য। কিছুক্ষণ পর দিয়া রুম থেকে বের হয়ে যায়। সাবিহা বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। দেখে যে দিয়া মোটরসাইকেলে উঠলো। এই মোটরসাইকেল থেকেই হর্ণের শব্দ আসছিলো। মোটরসাইকেলে উঠার সময় সাবিহার সাথে দিয়ার চোখাচোখি হয়। সাবিহা লজ্জা পেয়ে চোখ নামিয়ে নেয়।

সন্ধ্যার খানিকক্ষণ পরে দিয়া রুমে ফেরে। এসেই সাবিহাকে কোনরকম ঠেলে দিয়ে সাবিহার বিছানায় বসে। নিজ থেকেই বলতে শুরু করে, 'তখন যাকে দেখেছিলে সে আমার বয়ফ্রেন্ড। সেই ক্লাস সিক্স থেকে আমাদের রিলেশান জানো। ও না আমাকে অনেক ভালোবাসে, অনেক কেয়ারিংও, আমাকে কতো কেয়ার করে, আজ আমাকে...' সাবিহা বই থেকে চোখ তুলে দিয়ার দিকে চোখ পাকায়। দিয়া চুপ হয়ে যায়। খানিকক্ষণ চুপ থেকে আবার বলতে শুরু করে, 'এই তুমি কোন

কথা বলো না ক্যান? তুমি কি বোবা?' সাবিহা আবার রাগীরাগী চোখে তাকায়। দিয়া ভেবে নেয় সাবিহা বোবা। এবার সে হাত নেড়ে তার বয়ফ্রেন্ডের কথা বোঝাতে থাকে সাবিহাকে। সাবিহা হেসে দেয়। রাগীরাগী চেহারায় হঠাৎই হেসে ওঠায় সাবিহাকে বেশ সুন্দর লাগে। এটা সব বাঙালী মেয়েদেরই বৈশিষ্ট্য। তাই আমাদের দেশের ছেলেরা ইচ্ছে করে প্রিয়তমাদের কথা না শুনে তাদের রাগিয় তোলে। পরক্ষণেই আবার হাসানোর জন্য উদ্ভট কিছু করে বসে। এই যেমন কান ধরে উঠবস করা, কিংবা বাচ্চাদের মত করে ক্ষমা চাওয়া।

সাবিহা এবার খুব অল্প ভাষায় তার পরিচয় দিয়েই বইয়ে মুখ গোঁজে। দিয়া এদিকে নিজে নিজেই তার কথার ঝুলি মেলে বসে। এতো কথার মাঝে কোনটি তার পরিচয় আর কোনটি তার গল্প কোনকিছুতেই মাথা ঘামায় না সাবিহা। সে শুধু হুঁ হ্যাঁ করে যায়। প্রতিবারের হুঁ হ্যাঁ-তে দিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে বকবক করতে থাকে।

৫.

প্রথমদিনটা কোনমতে কেটে যায় সাবিহার। সারাদিন ধরে বই পড়ে। কিন্তু দ্বিতীয়দিন ঘুম থেকে উঠেই সে 'আম্মু' বলে জোরে ডেকে ওঠে। এই অভ্যাসটা তার সেই ছোট্টবেলা থেকে। ঘুম থেকে উঠেই আম্মুকে ডাকবে। আর শত ব্যস্ততার মাঝেও বর্ষা এসে তার দু হাতের কনিষ্ঠা আঙ্গুল দুটো ধরে বিছানা থেকে তোলে। কিন্তু আজ সাবিহার বাড়িয়ে দেওয়া হাত কেউই ধরছে না। হঠাৎই ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল তার। সারা সকাল সে বালিশে মুখ গুঁজে থাকল। দিয়া দুবার ডেকে সারা না পেয়ে আর ডাকলো না। গুনগুন করে ঘর আর বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করতে লাগল।

বিকেলের ক্লান্ত আলোয় সাবিহা বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। তার খুব একা একা অনুভব হচ্ছে। খুব ইচ্ছে করছে মা-বাবার কাছে যেতে। কিন্তু সে যে এখন আর চাইলেই সবকিছু করতে পারবে না। সে যে এখন অনেক বড় হয়ে গেছে। একাকীত্ব তাকে গ্রাস ফেলছে ধীরে ধীরে। নিজেকে বেশ দুর্বল মনে হতে লাগল। বারান্দা থেকে রুমে গিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিলো। বই পড়তেও ইচ্ছে করছে না। চোখ বুজে আছে সে। কখন যে ঘুমিয়ে গেলো কিছুই মনে নেই। ঘুম থেকে উঠল সন্ধ্যার একটু পরে। ঘুম থেকে উঠে দেখলো দিয়া রুমে নেই। কিছুক্ষণ পরেই দিয়া এলো। ঠোঁটের লিপস্টিকগুলো পুরো মুখে মেখে আছে। চুলগুলোও এলোমেলো। রুমে ঢুকেই সোজা ওয়াশরুমে চলে গেলো। সাবিহা ভ্রূ কুঁচকে বাঁকা চোখে তাকিয়ে আছে দিয়ার দিকে।

৬.

সাবিহা, দিয়ার ক্লাস শুরু হল। সাবিহা ভেবেছিল ক্লাস শুরু হলে আর একা একা লাগবে না। পড়াশুনা নিয়ে বিজি থাকা যাবে। কিন্তু নাহ! পড়াশুনাতেও তার মন বসছে না। পড়তে বসলেই

সে হারিয়ে যেতে থাকে নিজের মাঝে। বাবা-মাকে নিজের সমস্যা বলতে চেয়েও বলতে পারছে না। সে জানে এর সমাধান তার বাবা-মা করতে পারবে না। শুধু শুধু তাদের চিন্তায় ফেলার কোন মানেই হয় না।

এমনিতেই সারাদিন মন খারাপ থাকে, তার উপর দিয়ার বকবকানিতে কিছুই ভালো লাগছে না সাবিহার। তার কথায় কোন সাড়া না দিলে সে খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর বয়ফ্রেন্ডকে ফোন দিয়ে শুরু করে দেয় রাজ্যের আলাপ। সাবিহার এসব অসহ্য লাগে। না পারে কিছু বলতে, না পারে সইতে। বললেও যে খুব একটা ফল পাওয়া যাবে তাও নয়।

দেখতে দেখতে ভার্সিটি লাইফের আট মাস কেটে গেলো। এই আট মাসে সাবিহা একটা ভালো বন্ধুও জোগাড় করতে পারেনি। ঘুম থেকে উঠে ক্লাস যাওয়া, ক্লাসে চুপচাপ স্যারের লেকচার শোনা, মেসে এসে বই পড়া। এভাবেই চলতে থাকে সাবিহার দিন। ছোটবেলা থেকেই বাইরর জগতের সাথে অপরিচিত সাবিহা। তাই মানুষদের সাথে মিশতে তার মধ্যে এক ধরণের জড়তা কাজ করে। আর এই জড়তার কারণে সে কারো সাথেই ভালো করে মিশতে পারে না। প্রতি মাস অন্তর বাবা-মা এসে মেয়েকে দেখে যায়। কিন্তু সাবিহার একাকীত্ব কাটে না। বাবা-মা চলে গেলে আবার একাকীত্বে ভোগে।

বিকেলে সাবিহা বারান্দায় দাঁড়িয়ে কানে হেডফোন গুঁজে গান শুনে। প্রতিদিনের মত আজও সেই মোটরসাইকেলে করে একটি ছেলে এসে হর্ণ বাজায়। এতোদিনে সে বুঝেছে এই হর্ণটি আসলে দিয়াকে জানান দেওয়ার সংকেত যে সে এসেছে। দিয়া তড়িঘড়ি করে নিচে নেমে চলে যায়। বাইকে চেপে বসে সাবিহাকে দেখে ছোট্ট করে হাত নেড়ে বিদায় জানায়। সাবিহা ওদের দিকে তাকিয়ে থাকে। আগে ওদের এই ঘুরতে যাওয়া সাবিহার অসহ্য লাগতো। আজ কেনো জানি বেশ ভালো লাগছে। সাবিহা তাদের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকে। কিছুদূর যেতেই দিয়া তার বয়ফ্রেন্ডকে জড়িয়ে ধরে। মোটরসাইকেলের গতি যেনো হঠাৎই বেড়ে যায়। তারা মিলিয়ে যায় অসীমে। সাবিহা তখনও চেয়ে থাকে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে। ভেতরে ভেতরে অন্যরকম একটা অনুভূতি হয় তার।

সাবিহা রুমে চলে আসে। কোন কিছুতেই তার মন বসছে না। একবার বিছানায় শুয়ে পড়ছে, আবার বসছে, আবার শুয়ে পড়ছে। সময় কাটানোর মত কিছুই করার নেই। ইদানিং আর বই পড়তেও ভালো লাগে না। একঘেয়েমি ভাব চলে আসে। হঠাৎ ভাবলো রুমটি গোছানো যাক। তার অংশটুকু মোটামোটি গোছানোই থাকে। যত জঙ্গল দিয়ার বিছানা আর পড়ার টেবিল। দিয়ার বিছানা গোঁছ করে দিয়ার টেবিল গোঁছাতে লাগল সাবিহা। বইগুলো ঠিক করতেই চোখে পড়ল, বইগুলোর পেছনে লুকিয়ে রাখা আছে একটি ডায়েরির দিকে। গোলাপী মোড়কে মোড়ানো

বেশ সুন্দর একটি ডায়েরি। সাবিহার খুব পড়তে ইচ্ছে করল। প্রথমে ভাবল দিয়াকে না জানিয়ে পড়াটা ঠিক হবে না। কিন্তু কি মনে করে সে ডায়েরিটা পড়া শুরু করল।

সাবিহা যেমনটা ভেবেছিল ডায়েরিটায় মোটেই তেমন কিছু নেই। সাবিহা ভেবেছিল সারাদিন বকবক করা মেয়েটির ডায়েরিতে হাবিজাবি গোছেরই কিছু লেখা থাকবে। কিন্তু প্রথম পাতাটা পড়েই সাবিহার ভুল ভেঙ্গে গেলো। দিয়া যতটা বকবক করে, ডায়েরিতে সে ততটাই স্বল্পভাষী। খুব সুন্দর করে তার জীবনের ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনা লেখা। মাঝের দিকের অধিকাংকশ ঘটনাই রাফিযকে কেন্দ্র করে। একটি পৃষ্ঠা এরকম :

ডায়েরি জানো, আজ না রাফিয আমাকে তিনটে কদম ফুল দিয়েছে। কদমফুলগুলো বৃষ্টিতে ভিজে গিয়েছিলো। রাফিয আমাকে পড়িয়ে দিতে চাইলো। কিন্তু গাধাটা ডাটাগুলো আগেই ভেঙ্গে ফেলেছে। আমাকে কদম পড়িয়ে দিতে না পেরে রাফিযের মুখ গোমরা হয়ে গেলো। আর আমার সে কি হাসি !

সাবিহার বেশ ভালো লাগছে তাদের ভালোবাসার দুষ্টুমিষ্টি গল্পগুলো পড়তে। ডায়েরির একটি পাতায় গোলাপের বেশ কয়েকটি পাঁপড়ি শুকিয়ে পড়ে আছে। দিয়া তার নিচে লাল কালিতে সুন্দর করে লিখেছে, রাফুটা আমাকে এই গোলাপ দিয়েই প্রপোজ করেছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় গোলাপের পাঁপড়ি ছিল মাত্র তিনটি। ভ্যাঁ....বাকি পাঁপড়িগুলো তার জিন্সের প্যান্টের পকেটেই পড়ে ছিল। জিন্সের পকেটে কি কেউ কখনো গোলাপ আনে বলো ? তাও আবার প্রপোজ করার জন্য। ভ্যাঁ........

নিচের দরজা খোলার শব্দ হল। সাবিহা ডায়েরিটা আগের জায়গায় রেখে টেবিল গোছাতে লাগল। দিয়া বেশ বিষন্ন হয়ে ঘরে ঢুকল। সাবিহার ইচ্ছে করতে করল দিয়াকে জিজ্ঞেস করবে কি হয়েছে। কিন্তু সে করল না। দিয়া এসেই বিছানায় সুয়ে পড়ল। চোখ বন্ধ করে আসে সে। চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। দিয়ার হঠাৎ করে এমন শান্ত হয়ে যাওয়ায় সাবিহা বেশ অবাক হল।

ঘুমুতে যাওয়ার সময় সাবিহার শুধু ডায়েরির কথাগুলো মনে পড়তে লাগল। কত্তো সুন্দর তাদের জীবনটা ! সেদিন রাত্রে সাবিহা অদ্ভুত একটি স্বপ্ন দেখল। একটি লাল পাঞ্জাবী পড়া ছেলের পাশে সে দাঁড়িয়ে আছে। তার পরনে লাল টুকটুকে একটা শাড়ি। তারা দুজন একটি নির্জন রাস্তা ধরে হাঁটছে। রাস্তার দুপাশে সারি সারি গাছ লাগানো। হঠাৎই একটি কদম গাছের তলায় দাঁড়িয়ে গেলো ছেলেটি। নাকের উপর নেমে আসা কালো ফ্রেমের চশমাটি ঠেলে চোখ পর্যন্ত নিয়ে গেলো। তারপরেই গাছের হেলে পড়া একটি ডাল থেকে তিনটি কদম ছিঁড়ল। অমনি গাছের ডালে জমে থাকা বৃষ্টির পানির ফোঁটা ভিজিয়ে দিলো দুজনকে। সাবিহার ঘুম ভেঙ্গে গেলো। তার খুব জানতে

ইচ্ছে করছে ছেলেটি কি তাকে কদম ফুলগুলো চুলে গুঁজে দেবে নাকি রাফিযের মত অবস্থা হবে তারও।

সাবিহা তাড়াতাড়ি ঘুমানোর চেষ্টা করল, বাকি স্বপ্নটি দেখার আশায়। কিন্তু সে রাতে আর সে ঘুমুতে পারলো না।

৭.

ইদানিং দিয়া বেশ বদলে গেছে। শুধু দিয়া না, তার আশেপাশের পরিবেশও নিশ্চয় বদলে গেছে। সাবিহার তাই-ই মনে হয়। এখন আর সে সারাদিন বকবক করে না। ফোনেও আগের মত আহ্লাদী গলায় কথা বলে না। সারাদিন মনমরা হয়ে পড়ে থাকে। রিফাযের সাথেও আগের মত কথা হয় না। যেটুকু কথা হয়, তাতে কথার চেয়ে ঝগড়াই বেশি হয়। বিকেলে আর মোটরসাইকেলের হর্ণও শোনা যায় না। কিন্তু দিয়া প্রতিদিন বিকেলে বাইরে যায়। সাবিহা একদিন জিজ্ঞেস করল। দিয়া হাসির চেষ্টা করে বলল রিফাযের সাথে দেখা করতে যাই।

সাবিহাও বেশ পাল্টেছে। সে আর আগের মত চুপচাপ থাকে না। আগে দরকার না থাকলে আয়নায় সামনে কেনো ধারেকাছেই ঘেঁষতো না সে। আর এখন কি না সময় পেলেই আয়নায় সামনে দাঁড়ায়। কপালে লাল টিপ দিয়ে নিজেকে এক নজর দেখে দুহাত দিয়ে লজ্জায় মুখ ঢেকে ফেলে। মাঝেমাঝে নিজের ওড়না মাথায় দিয়ে আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের চোখে চোখ রাখে। লজ্জায় গালদুটি লাল হয়ে যায়। সে চোখ সড়িয়ে নেয়। এখন সে একটু সাজুগুঁজু করে ভার্সিটিতে যায়। কিন্তু এখনো কেউ তার বন্ধু হতে পারে নি। ছোটবেলা থেকে একা থেকে থেকে সে কারোর সাথেই মিশতে পারে না। কাউকেই তার পছন্দ হয় না। রিশা নামের এক মেয়ের সাথে তার বন্ধুত্ব হয়েছিল। কিন্তু বন্ধু হওয়ার পরেরদিন থেকেই সে বুঝতে পারল রিশার অনেক ছেলে ফ্রেন্ড। সাবিহা শুধুমাত্র এই কারণেই রিশার সাথে কথা বলা বন্ধ করে দিলো। ফাইজা নামের এক সাদাসিধে মেয়ের সাথেও বন্ধুত্ব ভাঙ্গলো অতিরিক্ত কথা বলার জন্য। সাবিহা দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছে। আসলে দোষ কার? তার না অন্যের? অন্যরা কেনো তার মত হতে পারে না? নাকি সে নিজেই অন্যদের মত হতে পারছে না। বাবা-মার কথা খুব মনে পড়ছে তার। যতই দিন যায়, ততই একাকীত্ব তাকে গ্রাস করে।

বিকেলে বিছানায় হেলান দিয়ে বসে আছে সাবিহা। বারান্দা থেকে খুব সুন্দর বাতাস আসছে। কিন্তু বারান্দায় যেতে ইচ্ছে করছে না তার। সে জানে বারান্দায় গেলেই এই মৃদু বাতাস আর মৃদু থাকবে না, অসহ্য ঠান্ডা লাগবে। কিছু জিনিস দূর থেকেই অনুভব করতে হয়। কাছে গেলেই তার সৌন্দর্য নষ্ট হয়।

বেশ কিছুদিন থেকেই সাবিহা নিজেকে অপরাধী মনে করছে। দিয়ার ডায়েরিটা না বলে পড়াটা একেবারেই উচিত হয় নি। বলবে কি না ভেবে পাচ্ছে না। তাই হঠাৎ করে বলেই ফেলল, 'দিয়া তোমার লিখার হাত চমৎকার। তোমার ডায়েরিটা আমি লুকিয়ে পড়েছি। কিছু মনে করো নি তো?'

দিয়া তার বিছানায় আনমনে বসে ছিল। তার দৃষ্টি জানালা দিয়ে বাইরের শিউলি গাছে। সাবিহার কথায় তার মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া হল না। সে আনমনে হয়েই বলে, 'না, কিছু মনে করিনি'। সাবিহা বুঝতে পারে, দিয়ার বিষন্নতা ধীরে ধীরে বাড়ছে। আগে দিয়া সাবিহার সাথে যেচে এসে কথা বলতো। এখন আর বলে না। সাবিহারও খারাপ লাগে এটা ভেবে। সে নিজ থেকেই দিয়াকে প্রশ্ন করে, 'কিছু হয়েছে তোমার? বেশ চুপচাপ লাগছে কেনো জানি?'

দিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'নাহ কিছুই হয় নি'। সাবিহা চুপ করে থাকল। কি বলবে ভেবে পেলো না। দিয়া সাবিহার বিছানায় এসে বসল, সাবিহার গায়ে গা ঘেঁষে। 'আচ্ছা কাছের মানুষরা কেনো এতো কষ্ট দেয় বলোতো?' দিয়ার প্রশ্নে সাবিহা হতভম্ব হয়ে যায়। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বলে, 'কেনো কি হয়েছে?' দিয়া ফুপিয়ে ফুপিয়ে কেঁদে ওঠে। কোনমতে নিজেকে সামলে নিয়ে কাঁদো কাঁদো গলায় বলে, 'রাফিয বলেছে, ও নাকি আমাকে বিয়ে করতে পারবে না। আমি কারণ জানতে চেয়েছি। ও কিছুই বলেনি। কিন্তু আমি তো ওকে ছাড়া থাকতেই পারছি না। আজ তিনদিন থেকে আমাদের কথা নেই জানো।' দিয়া এখনো কাঁদছে। সাবিহাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে সে। সাবিহা চুপচাপ তার দিকে তাকিয়ে থাকে। এরকম পরিস্থিতিতে সে আগে কখনো পড়েনি।

৮.

তিন ঘন্টা ধরে আয়নার সামনে বসে সাজছে দিয়া। পাঁচ দিন পর রিফায তাকে মেসেজ দিয়েছে। সে দেখা করতে চেয়েছে। দিয়া গুনগুন করে গান গাইছে আর ঠোঁটে গাঢ় করে লিপস্টিক দিচ্ছে। কপালের টিপটা ঠিক করে নিয়েই দাঁড়িয়ে গেলো সে। ঘুড়ে ঘুড়ে নিজেকে দেখছে। এর মাঝেই মোটরসাইকেলের হর্ণ শোনা গেলো। দিয়া দৌঁড়ে রুম থেকে বের হতেই সাবিহা বলে উঠল, 'দিয়া তোমার ডায়েরিটা একবার পড়ি?' দিয়া সাবিহাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে 'একবার না, হাজারবার পড়ো, আজ আমি অন্নেক খুশি!' কথাটি শেষ না করতেই দিয়া রুম থেকে বের হয়ে চলে গেলো।

সাবিহা ডায়েরিটা নিয়ে পড়া শুরু করল। সে জানে না সে কেনো একই জিনিস বারবার পড়ছে। কেনোই তার এতপ ভালো লাগছে। ডায়েরির প্রথমদিকের একটি পৃষ্ঠায় আজ চোখ আটকে যায় তার। এর আগেও পুরো ডায়েরিটা পড়লেও এটা চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল হয়তো। পৃষ্ঠার উপরে বড় করে লেখা 'আমার ভাড়াটে ভালোবাসা'। নিচে মেঘ নামের একটি ছেলের সাথে দিয়ার এক

মাসের রিলেশানের কাহিনি লেখা। সাবিহা কিছুই বুঝতে পারে না। তার মাথায় জট লেগে যায়। দিয়া তার জীবনের বিশেষ কিছু ঘটনা ডায়েরিতে লেখে, পুরো ঘটনা লেখে না। তাই সহজে কিছু বোঝার উপায় নেই।

যথারীতি সন্ধ্যার একটু পরেই দিয়া রুমে ফিরল। আজও চুল এলোমেলো, লিপস্টিক ঠোঁটের আশেপাশে লেপ্টে গেছে। সাবিহার চোখে চোখ পড়তেই দিয়া একটু লাজুক হাসি দিলো। তারপরেই শুরু হল আগের মতো বকবকানি। 'জানো আজ না ও আমাকে বিশটা গোলাপ ফুল দিয়ে সরি বলেছে, জানো আজ না ও কান ধরে উঠবস করেছে....' আরো কত কি! প্রথমদিকে বিরক্ত লাগলেও সাবিহার এখন এসব শুনতে বেশ লাগে। সেও অনুভব করে তারও যদি এমন কেউ থাকতো। অনুভবের সাদা মেঘগুলো দলা পাকিয়ে ভেসে বেড়ায় মনের পুরো আকাশ জুড়ে। সাবিহা আনমনে হয়ে যায়। কল্পনার রাজ্যে আবিষ্কার করে নিজেকে। শুধু নিজেকে নয়, তার পাশে আরেকজনকে। দিয়ার কথায় ঘোর ভাঙ্গে সাবিহার।

সাবিহা বেশ কৌতুহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে দিয়াকে প্রশ্ন করে, 'আচ্ছা তোমার ডায়েরিতে মেঘ নামের একটি ছেলের নাম লিখা। উপরে আবার লেখা তোমার ভাড়াটে ভালোবাসা। বিষয়টা আসলে কি?'

সাবিহা হো হো করে হেসে ওঠে। 'আর বলো না। আমি তখন ক্লাস টেনে পড়ি। প্রিটেস্ট পরীক্ষা শেষ হবার পরেরদিন রিফাযের সাথে আমার প্রচন্ড ঝগড়া হয়। টানা বাইশদিন আমাদের কথা হয়নি। তখন আমি রাগ করে মেঘের সাথে ভালোবাসার অভিনয় করি, যাতে রিফায হিংসায় জ্বলে। আমি তখন মেঘকে নিয়ে ইচ্ছে করে রিফাযদের বাসার সামনে দিয়ে হাঁটাহাঁটি করতাম। আমার সাথে অন্য ছেলেকে দেখতে না পেরে একদিন ও এসে আমার কাছে ক্ষমা চায়। আর আমাদের রিলেশান আগের মতো হয়ে যায়।'

'আর মেঘ?', দিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ে সাবিহার উদ্বিগ্ন কন্ঠে প্রশ্ন

'আমি মেঘকে ওর পাওনা টাকা দিয়ে দেই।' দিয়ার ভাবলেশহীন উত্তর

'পাওনা টাকা মানে?' সাবিহার প্রশ্ন।

আরে আমি তো মেঘের সাথে চুক্তি করেছিলাম। ও আমার সাথে ভালোবাসার অভিনয় করবে, বিনিময়ে টাকা নেবে। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে মেঘ। পড়ার খরচ জোগাতেই ও এই পথ বেছে নিয়েছে। আমিও এতে দোষের কিছু দেখি না। জানো মেঘ না সুন্দর সুন্দর কবিতাও লিখতে পারে। তবে প্রতিটি কবিতার জন্য পাঁচশ করে টাকা নেয়। অনেকদিন তার সাথে

যোগাযোগ নেই। তবে যতটুকু জানি ও আমাদের ভার্সিটিতেই পড়ে। আমাদের এক ব্যাচ সিনিয়ার।

সাবিহা যেসব শুনছে তা যেনো নিজ কানে বিশ্বাস করতে পারে না। বাইরের জগতের অনেক কিছুই তার অজানা। কিন্তু তাই বলে যে এমন অদ্ভুত অদ্ভুত বিষয় ঘটতে পারে, তা তার ধারণার বাইরে ছিল।

দিয়া বিছানা থেকে উঠতে উঠতে সাবিহার বিস্ময়ভরা চোখের দিকে তাকিয়ে দিয়া বলল, 'মেঘকে নিয়ে দেখি ভালোই আগ্রহ। এই যে আমার ফোন। মেঘ নামে তার নাম্বার সেভ করা আছে। তার নাম্বারে কল দিয়েই সব জেনে নেও।' কথাগুলো বলে খিলখিল করে হাসতে হাসতে দিয়া ফ্রেশ হতে চলে গেলো। সাবিহা বেশ লজ্জা পেলো। নিজেই নিজেকে বেহায়া বলে গালি দিলো। কি দরকার ছিল অন্য ছেলে সম্পর্কে এতোকিছু জানার। আড়চোখে পাশে পড়ে থাকা দিয়ার মোবাইলের দিকে তাকিয়ে ওয়াশরুমের দিকে কান পাতল। পানি পড়ার শব্দ হচ্ছে। দিয়ার বের হতে সময় লাগবে। সাবিহা টুপ করে দিয়ার মোবাইল থেকে মেঘের নাম্বারটি বের করে। একবার চোখ বুলায়। কিন্তু কি মনে হতেই মোবাইলটি রেখে দেয়।

গভীর রাত। সাবিহার চোখে ঘুম নেই। দিয়ার বিছানার দিকে তাকিয়ে দেখে দিয়া ঘুমুচ্ছে। মেঘ নামের ছেলেটি তার মনে শক্ত একটা স্থান নিয়ে ফেলেছে। সে অন্যরকম অনুভব করছে। ভালোবাসা? না সহানুভূতি? নাকি শুধুই আগ্রহ? এই অনুভূতির নাম সাবিহা জানে না। বিছানায় শুয়ে শুয়ে জানালার দিকে তাকিয়ে আছে সাবিহা। শিউলি গাছটির দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল তখন নাম্বারটি লিখে নিলেই ভালো হতো। নাম্বারটি মনে করার চেষ্টা করল। কিন্তু প্রথম তিনটি ডিজিট আর শেষের দুইটি ডিজিট ছাড়া আর কিছুই মনে পড়ছে না। খুব অস্থির অস্থির লাগতে শুরু করল সাবিহার। কোনমতেই নাম্বারটা মনে পড়ছে না। কি মনে হতেই সাবিহা পা টিপে টিপে দিয়ার বিছানার কাছে গেলো। কাঁপা কাঁপা হাতে ঠোঁট দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে সলজ্জ নয়নে দিয়ার ফোনটি হাতে নিল। ডিসপ্লে অন করতেই চোখে পড়ল রাফিযের একটি মেসেজ

'আই লাভ ইউ, বউটুসসস !

জানি তুমি ঘুমিয়ে পড়েছো, সকালে উঠে আমার মেসেজ দেখেই চমকে যাবে। চমকে যাওয়ার পর তোমাকে হাসলে না অনেক মিষ্টি লাগে। একেবারে বাচ্চা বাচ্চা লাগে।'

মেসেজটি পড়ে সাবিহার ভেতরে ঝড় উঠে গেলো। অন্যরকম এক অনুভূতির ঝড়। সে কল্পনা করে তার জন্যেও কেউ গভীর রাতে এমন করে মেসেজ দেবে, তাকে ভালোবাসবে ! তার একাকীত্বে তার সঙ্গী হবে। সাবিহার এমন কল্পনা দোষের কিছু নয়। রুপেগুণে সেও কম নয়। সে আর দেরি না করে দিয়ার মোবাইল থেকে মেঘের নাম্বারটি টুকে নিলো।

নাম্বারটি নেওয়ার পর তার অস্থিরতা আরো বেড়ে গেলো। বিছানায় শুয়ে থাকতে ভালো লাগছে না। সে বারান্দায় চলে গেলো। জ্যোৎস্না রাত। বাড়ির সামনের বাগানটা আলোকিত হয়ে আছে। শিউলি তলায় অনেক শিউলি জমেছে। খুব সুন্দর ঘ্রাণ আসছে সেখান থেকে। সে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছে এতো রাতে মেঘকে ফোন দেওয়াটা ঠিক হবে কি না। আগপাছ ভাবতে ভাবতে সাবিহা ফোনই দিয়ে দিলো। তিনবার রিং হতেই মেঘ ফোন ধরল। খুব শীতল গলায় বলল, 'হ্যালো!' সাবিহার বুকটা ধক করে কেঁপে উঠল। এই প্রথম সে কোন অপরিচিত ছেলের সাথে ফোনে কথা বলছে। মুখ দিয়ে কোন শব্দ বেরুচ্ছে না। মেঘ আবার বলে উঠল, 'হ্যালো'। এবার একটু জোরালো গলায়। কোন উত্তর না পেয়ে সে ফোন রেখে দিলো। সাবিহা আবার ফোন দিল। এবার ফোন ধরতে কিছুক্ষণ দেরি হল। এবার মেঘ কোন কথা বলল না। সাবিহাই কাঁপা কাঁপা কন্ঠে বলল,

- হ্যালো

- জ্বী বলুন। নম্র গলায় বলল মেঘ।

- আমি কি মেঘের সাথে কথা বলছি?

- জ্বী। কিন্তু আপনি কে বলছেন?

- আ....আমি বলছি। আমার নাম সা...অন্তলীনা। আসল নাম বলতে ভয় হচ্ছিলো সাবিহার। তাই এমনি একটি নাম বলল। হুট করে অন্তলীনা নামটি মাথায় এসেছিল।

সাবিহা কোন কথা খুঁজে পাচ্ছে না। আবার অপাশ থেকে মেঘও নিজ থেকে কোন কথা বলছে না। সাবিহা চোখ মুখ শক্ত করে মনের কথাটি বলেই ফেলল, 'আপনার সাথে কিছু কথা ছিল। আমরা কি কাল দেখা করতে পারি?'

মেঘ ভাবলেশহীন ভাবে উত্তর দিলো, 'আচ্ছা। কোথায় দেখা করবেন?'

- টিএসসি?

- আচ্ছা।

৯.

বিকেল চারটা বেজে কুড়ি মিনিট। টিএসসিতে এসে পৌঁছেছে সাবিহা। দিয়াকে বলে এসেছে লাইব্রেরি যাচ্ছে নোট করতে। সময়ের পঁচিশ মিনিট আগেই পৌঁছে গেছে সে। বেশ সেজেগুছেই এসেছে। লাল টকটকে সালোয়ার কামিজ, হাতে কাঁচের লাল চুড়ি, আর কপালে ছোট্ট একটা লাল টিপ। খুব ইচ্ছে ছিল মায়ের দেয়া লাল শাড়িটা পড়তে। কিন্তু লজ্জায় পড়তে পারেনি। টিএসসির এক কর্ণারে বসে আছে সাবিহা। অধীর আগ্রহে প্রহর গুনছে। বারবার ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে।

মাঝেমাঝে চুলের খোপায় হাত দিয়ে দেখছে ঠিক আছে কি না। সে ভাবতে লাগল মেঘ কি পড়ে আসবে? একটি মেয়ে তার সাথে দেখা করতে চেয়েছে। নিশ্চয়ই সে সেজেগুছে হ্যান্ডসাম বাবু সেজে আসবে। সেদিনকার স্বপ্নের মত লাল পাঞ্জাবি, পরিপাটি চুল, আর মায়াভরা এক জোড়া চোখ নিয়ে সামনে উপস্থিত হবে সে। আচ্ছা কেমন হবে তার চেহারা? পুরো মুখে কি ছোপ ছোপ দাঁড়ি থাকবে, নাকি একটিও দাঁড়ি থাকবে না? গালগুলো কি ফোলা ফোলা হবে, নাকি চোয়ালের সাথে লেগে থাকবে রাত জাগা মানুষদের মত?

টুং করে শব্দ হল। ঘড়ির কাঁটায় পাঁচটা বাজল। সাবিহা দেখল দূর থেকে একজন এগিয়ে আসছে তার দিকে। সাদা পাঞ্জাবি পরিহিত লম্বামতো একজন। দ্রুত পা ফেলে তার দিকে এগিয়ে আসছে। মুখে খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি, বেশ মানিয়েছে গোলগাল মুখের সাথে। সাবিহা চোখ নামিয়ে নিল। এ মেঘ নয়। কাল রাতে তো মেঘকে বলেছিল লাল পাঞ্জাবি পড়ে আসতে যাতে সে তাকে চিনতে পারে। কিন্তু ছেলেটি যে তার দিকেই আসছে। কাছাকাছি আসতেই ছেলেটি হাঁপাতে হাঁপাতে বলল,

- আপনি অন্তলীনা না?

সাবিহা চমকে গেলো। কেবল মেঘই জানে তার নাম অন্তলীনা। তাহলে এই ছেলেই কি মেঘ?

- আপনি মেঘ?

- জ্বী

- কিন্তু আপনার তো লাল পাঞ্জাবী পড়ে আসার কথা ছিল

- আসলে কাল রাতে ফোন রাখার পর মনে হয়েছিল আমার লাল পাঞ্জাবি নেই

- ও

সাবিহার কথা বলতে বেশ লজ্জা লাগছে। কখন কি বলবে সব গুলিয়ে যাচ্ছে। মুখ দিয়ে যে কেমন করে কথা বের হচ্ছে সে নিজেই বুঝতে পারছে না। চোয়াল শক্ত করে রেখে কথা বলছে সে। মেঘ ভাবলেশহীনভাবে বসে আছে। পাঞ্জাবিটা কুঁকড়ে আছে। চুলগুলোও এলোমেলো। বোঝাই যাচ্ছে কোনমতে নিজেকে উপস্থাপন করেছে সাবিহার সামনে। সাবিহার মন একটু খারাপ হয়ে গেলো। সে ভেবেছিল মেঘ অনেক গুরুত্ব দিয়ে নিজেকে সাজিয়ে তার সামনে উপস্থিত করবে। কিন্তু মেঘকে যে খুব খারাপ লাগছে তা কিন্তু নয়। একটা কবি কবি ভাব আছে তার মধ্যে। চোখের নিচে কালি জমে আছে। ঠোঁটটাও বেশ কালো। নিশ্চয় সিগারেট খায় – সাবিহা ধারণা করল।

- শুনেছি আপনি টাকার বিনিময়ে মিথ্যে ভালোবাসার অভিনয় করেন।

- জ্বী

- সত্যি ভালোবাসার অভিনয় করতে পারবেন টাকার বিনিময়ে?

- না

- কেনো?

- সত্যি ভালোবাসা টাকার বিনিময়ে হয় না, হয় ভালোবাসার বিনিময়ে

- মাসে কত নেন?

- পনেরো হাজার টাকা

- এখন থেকেই অভিনয় শুরু করবেন?

- আপনি বললে তাই করব

- নাহ, কাল থেকে। ফুচকা খাবেন?

- না

- আমার সাথে ভালোবাসার অভিনয় করলে ফুচকাও খেতে হবে

- আচ্ছা।

১০.

শুক্রবারের সকালটা যেনো সাবিহার জন্য একটু বেশিই মিষ্টি হয়। সকাল সকাল গোসল সেরে বারান্দায় এসে দাঁড়ায় সাবিহা। সকালের মিষ্টি রোদ সাবিহার নরম গাল ছুঁইয়ে দেয়। গতকালের কথা ভাবতেই সাবিহা লজ্জায় চোখ বন্ধ করে। কাল যে কিভাবে সে অতগুলো কথা বলেছিল, সেটা তার নিজের কাছেই একটা রহস্য এখনো। দিয়া এখনো ঘুমুচ্ছে। বারান্দায় আনমনে হাঁটাহাঁটি করতেই ভাবলো মেঘকে ফোন দেওয়া যাক। মেঘকে ফোন দিল সাবিহা। অপাশের শান্ত শীতল গলা শুনেই কিছুক্ষণ চুপ করে রইল সে। মনে মনে ভাবতে লাগল, একটা ছেলের কন্ঠ কেমন করে এতো মিষ্টি হতে পারে? ইচ্ছে করে সারাজীবন কান পেতে তার কথা শুনতে। সাবিহার কথা বলতেও ভয় হয়। যদি মেঘের কথায় বিঘ্ন ঘটে, যদি তার কন্ঠস্বর বদলে যায়। সাবিহা মেঘকে বিকেলে ধানমন্ডি লেকে দেখা করতে বলল। মেঘ ঠান্ডা গলায় বলল, 'আচ্ছা'। মনে হচ্ছে বিকেলে তার কোন কাজ ছিল। তাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলল না। বিকেলে মেঘ যথাসময়ে ধানমন্ডি লেকে উপিস্থিত হল। পুরো বিকেল জুড়ে তারা একসাথে হাঁটল। সাবিহা ফুচকার দোকানে এসে ফুচকার অর্ডার দিলো। মেঘ তার জোড়া ভ্রুযুগল কুঁচকালো।

- অমন করে ফুচকার দিকে তাকিয়ে আছো কেনো?

- না, এমনি

- ফুচকা খাও না?

- না না খাই তো।

বলেই মুখে ফুচকা পুরে দিলো। মরিচে কামড় পড়ায় চোখ লাল হয়ে গেলো। জোরে জোরে শ্বাস নিতে লাগল। সাবিহা পানি এগিয়ে দিলো। পানি খেয়ে মেঘ কিছুটা শান্ত হল।

- আচ্ছা জোর করে খেতে হবে না

- আচ্ছা।

সাবিহাকে মেসে পৌঁছে দিয়ে মেঘ বাড়ির পথে রওনা দিতেই, সাবিহা পেছন ঘুরে ডাকলো

- শুনো, আমার জন্য প্রতি সপ্তাহে একটা করে চিঠি লিখবে।

- আচ্ছা।

রুমে ঢুকতেই দেখল দিয়া বসে আছে।

- আজ রাফিয আসে নি?

- না

- আবার ঝগড়া হয়েছে নাকি?

- না

-মন খারাপ?

- না

সাবিহা আর কথা বাড়ালো না। ফ্রেশ হতে চলে গেলো।

মেঘের সাথে কাটানো পাঁচ দিন বেশ ভালোই কাটল সাবিহার। মেঘের সাথেও মোটামোটি ফ্রি হয়ে গেছে সে। মেঘও এখন আর গম্ভীরভাবে থাকে না। সাবিহার সাথে হেসে হেসে কথা বলে। সাবিহার আর আগের মত একা একা লাগে না। সে অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। মফস্বল শহরে ঘরে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়ে ওঠা মেয়েটি আজ চোখে গাঢ় কাজল মেখে ভালোবাসার মানুষটিকে তার মধ্যে আগলে রাখে। ভেজা চুলের ঝাপটানো জলকণায় পাগল করে রাখে। এখন সে আর দিয়ার বকবকানিকে বকবকানি মনে করে না। সবার সাথেই সহজে মিশতে পারে। চোখের পলকেই যেনো তার সাদা-কালো জীবনটা রঙিন হয়ে গেলো। সে এখন আর উপন্যাস পড়ে না, পড়ে মেঘের কবিতা, ভালোবাসার কবিতা, যার প্রতিটি উপমায় থাকে সে। থাকে অন্তলীনা। এসবের মাঝেও সাবিহার ভয় ভয় করে। মাঝরাতে দুঃস্বপ্নে ঘুম ভেঙ্গে যায়। ভাবে মেঘ কি এখনো

অভিনয়ের ভেতরেই আছে, নাকি সত্যি সত্যি তাকে ভালোবাসে? মেঘকে প্রশ্ন করতেও ভয় হয়। অজানা এক ভয়। বুকটা ধুকপুক ধুকপুক করে। পরক্ষণেই মেঘের কোন ভালোবাসার মেসেজ তার ভয় কাটিয়ে দেয়।

১১.

দেখতে দেখতে ষোল দিন পার করে ফেলল সাবিহা আর মেঘ। সাবিহা আজ বায়না ধরেছে মেঘের গান শুনবে। পার্কে এতোজনের সামনে সাবিহার এমন বায়না শুনে মেঘ ভড়কে যায়। প্রথমে ভাবে সাবিহা ইচ্ছে করে বাচ্চামানুষী করছে। কিন্তু সাবিহা যখন অভিমানে গাল ফুলিয়ে বসে থাকে, তখন মেঘ বুঝে নেয় যে আজ তাকে গান গেতেই হবে। মিনমিনে গলায় সে গান ধরে।

- 'আমারো পরানো যাহা চায়,

তুমি তাই, তুমি তাই-ই গো

আমারো'

- ঐ থামো। মিনমিন করে কি বলতেছো?

- ইয়ে মানে গান গাচ্ছিলাম তো

- এইটাকে গান বলে না মরাকান্না বলে?

- মরাকান্নাই বলে। এতোজনের সামনে কি কোন জীবিত মানুষ গান গেতে পারে?

- হুঁ পারে। গাও

মেঘ গান ধরে। সাবিহা গানের সুরে ভেসে যায় তার কল্পনায়। নানা স্বপ্নে সে তার কল্পনায় রং মেশায়। আজানের শব্দে থেমে যায় মেঘ। ঘোর কেটে যায় সাবিহার। 'আচ্ছা মেঘ, বলতো তোমার কোন জিনিসটা আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে?'

মেঘ চুপ করে থাকে। সাবিহা বলে, 'তোমার কন্ঠ দেখে। এতো শীতল আর ঠান্ডা কন্ঠ আমি কখনো শুনি নি। তোমার কন্ঠ যেদিন প্রথম শুনেছিলাম, সেদিন যেনো আমাকে হৃদপিন্ড তোমার শীতল কন্ঠে জমে গিয়েছিল।'

মেঘ হাসে। কোন কথা বলে না।

সেদিন রাত্রে দিয়া বাসায় ফিরল না। দিয়াকে ফোনেও পাওয়া গেলো না। সাবিহা একবার ভাবলো শারমিন আন্টিকে বলবে। কিন্তু দিয়ার সমস্যা হতে পারে ভেবে বলব না। পরেরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখল দিয়া তার বিছানায় শুয়ে আছে। চোখের পাতা খোলা।

- কাল রাতে কই ছিলে? কোন বন্ধুর বাসায়?

- না, রিফাযের বাসায়।

- হঠাৎ?

- ওকে মেরে ফেলার জন্য।

সাবিহা আঁতকে ওঠে। কোনমতে নিজেকে সামলে নিয়ে সে দিয়ার তাকিয়ে তাকায়।

- মজা করছো না তো?

- না, ব্যাগে দেখো, বোতলে এখনো অর্ধেক পটাশিয়াম সায়ানাইড আছে।

সাবিহা যেনো নিজ কানে বিশ্বাস করতে পারছে না। দিয়াকে দেখেও মনে হচ্ছে না সে গতকাল রাতে খুন করে এসেছে। তাকে বেশ শান্ত দেখাচ্ছে। একটা বড় হাই তুলে সে ডায়েরি নিয়ে বসল। কিছু অংশ লিখছে আর ছিঁড়ে ফেলছে। আবার লিখছে আবার ছিঁড়ে ফেলছে। গুরুত্বপূর্ণ ক্লাসের কথা বলে সাবিহা তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে রুম থেকে বের হয়ে এলো। থেকে থেকেই তার গা শিউরে উঠছে। সে কি না এতোদিন এরকম একটি ভয়ংকর মেয়ের সাথে এক রুমে ছিল। অবশ্য সে কিছুদিন থেকেই লক্ষ্য করেছিল দিয়ার অস্বাভাবিক আচরণ। রিফাযের সাথে ঝগড়া লাগলে যেমন শান্ত হয়ে যায়, ঠিক তেমন শান্ত হয়ে গিয়েছিল সে। এই শান্তকে হওয়াকে অবশ্য শান্ত হওয়া বলে না, বলে বিষণ্নতা। মাঝেমাঝে মাঝরাতে উঠে দিয়া কান্নাকাটিও করতো। সাবিহা অনেকবার জানার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু দিয়া কোন কথাই বলেনি। গত তিনদিনে দিয়া সাবিহার সাথে একটি কথাও বলেনি। সারাদিন রুমে চুপচাপ শুয়ে থাকতো। সাবিহার এখন কি করা উচিত সে কিছুই ভেবে পাচ্ছে না। মেঘকে ফোন দিল। মেঘ ধরছে না। আবার ফোন দিল। এবারও ধরার কোন নাম নেই। পার্কের রাস্তা ধরে হাঁটছে সাবিহা। সবকিছু যেনো তার কাছে স্বপ্ন মনে হতে লাগল। সে চায় এটা স্বপ্নই হোক। পার্কে একা একা হাঁটতে আর ভালো লাগছে না। উঠতি বয়সী ছেলেগুলো কেমন ড্যাব ড্যাব চোখে তাকাচ্ছে। এদিকে মেঘও ফোর ধরছে না। রুমে ফিরে যাওয়াটা ঠিক হবে কি না, সে বুঝতে পারছে না। ভয় ভয় করলেও পার্কে থাকতে খুব বিরক্ত লাগছে তার। মেসের পথে হাঁটতে শুরু করল সাবিহা। মেসের সামনে আসতেই মেঘের ফোন।

- হ্যালো অন্তলীনা, ফোন দিয়েছিলে?

- হুঁ। কই ছিলে তুমি?

-ক্লাসে ছিলাম। কেনো?

-না এমনি।

পা টিপে টিপে রুমে ঢুকল সাবিহা। পুরো ঘরে ডায়েরির ছেঁড়া পাতা দুমড়ানো মুচড়ানো অবস্থায় পড়ে আছে। দিয়া ঘুমুচ্ছে। মুখে একটা হাসি হাসি ভাব। একেবারে ছোট্ট বাচ্চাদের মত লাগছে তাকে। সাবিহা দুমড়ানো কাগজের ভাঁজ ঠিক করে পড়ার চেষ্টা করল।

'আমার মনের হত্যাকারীকে আজ হত্যা করলাম। '

সাবিহা লাইনটির কিছুই বুঝল না।

১২.

দেখতে দেখতে ঊনত্রিশদিন পার হয়ে গেলো মেঘের সাথে। কালকেই একমাস পূর্ণ হবে। সাবিহা অস্থির হয়ে আছে। কালকেই সে তার ভালোবাসার কথাটি মেঘকে বলবে। সে যে মেঘকে সত্যি সত্যিই অনেক ভালোবেসে ফেলেছে, তা হয়তো মেঘ বুঝেও না বুঝার ভান করেছে। সাবিহার আজ কোন কাজেই মন বসছে না। ভেতরে ভেতরে এক ধরণের ছটফটানি কাজ করছে। ভাবছে। 'আচ্ছা মেঘকে যখন আমি বলব আমি তোমাকে ভালোবাসি। মেঘ কি তখন চমকে যাবে? নাকি বরাবরের মত ওটাকে আমাদের ভালোবাসার অভিনয় বলে ধরে নেবে? আচ্ছা মেঘ কি কাল আমার দেওয়া পাঞ্জাবীটা পড়ে আসবে?'

সাবিহা মেঘকে একটি লাল পাঞ্জাবি কিনে দিয়েছে। তার অনেকদিনের ইচ্ছে লাল শাড়ি পরিহিতা অন্তলীনার হাতে হাত ধরে হাঁটবে মেঘ। মেঘের পরনে থাকবে লাল পাঞ্জাবি।

পরেরদিন বিকেল বেলা।

মেঘ সাবিহাকে পার্কে আসতে বলল। সাবিহা আগে থেকেই তৈরি হচ্ছিলো। ঠোঁটে হালকা লিপস্টিক দিয়ে কপালের টিপটা ঠিক করেই সে রওনা দিল। পার্কে বসে আছে মেঘ। থেকে থেকেই ঘড়ির কাঁটা দেখছে। সাবিহার পৌঁছাতে সাত মিনিট দেরি হল। কিন্তু মেঘ লাল পাঞ্জাবি পড়ে আসে নি। পরনে তার চিটচিটে মেরুন কালারের একটি শার্ট।

সাবিহা আর মেঘ পাশাপাশি বসে আছে। কেউ কোন কথা বলছে না। অনেকক্ষণ পর নিরবতা ভাঙ্গল মেঘ।

-তোমাকে অনেক সুন্দর লাগছে অন্তলীনা

-তুমি লাল পাঞ্জাবি পড়ে আসোনি কেনো?

-ওটা সাইজে বেশি বড় হয়

-ছোট করে নিতে পারতে

-টাকা নেই

-হুঁ

-অন্তলীনা আজ ত্রিশদিন পূর্ণ হল। আমার....

সাবিহা ব্যাগ থেকে পনেরো হাজার টাকা বের করে মেঘের পাশে রাখলো। মেঘ টাকাগুলোয় হাত বাড়াতেই সাবিহা মেঘের চোখে চোখ রেখে বলে উঠল, 'ভালোবাসি তোমায়। সত্যি সত্যিই ভালোবেসে ফেলেছি তোমায়।'

মেঘ হাতটা পিছিয়ে নিলো। সাবিহার দিকে নির্বাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ঘোর কাটতেই উঠে হাঁটা শুরু করল মেঘ।

সাবিহা চিৎকার করে বলে উঠল, 'মেঘ তোমায় অনেক ভালোবাসি'

আকাশে মেঘ জমেছে। মেঘের গর্জনে সাবিহার কথাগুলি মেঘের কান অব্দি পৌঁছালো না।

সেদিন শহরের আকাশ পুরোটা মেঘে ঢেকে গিয়েছিল। মেঘের উপরে মেঘ এসে জমেছিল। আর অন্তলীনার আকাশ ছিল মেঘশূণ্য !

...........সমাপ্ত...........